The International Criminal Court (ICC) & Myanmar

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এবং মিয়ানমার

রোহিঙ্গা ইস্যুতে আইসিসিতে ইতোমধ্যে কী ঘটেছে?

মিয়ানমার এখন পর্যন্ত আইসিসির সদস্য নয়। দেশটি আইসিসি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন/চুক্তি তথা রোম সংবিধিও গ্রহণ করেনি অর্থাৎ মিয়ানমার এই চুক্তির একটি "সদস্য রাষ্ট্র" নয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, মিয়ানমার আইসিসির এখতিয়ার গ্রহণ করেনি।

অন্যদিকে, ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ আইসিসির রোম সংবিধির একটি সদস্য রাষ্ট্র। বাংলাদেশ আইসিসির এখতিয়ারও গ্রহণ করেছে।

এপ্রিল ২০১৮:

রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ যাচাইয়ে আইসিসি এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে কি না – এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে আইসিসির চিফ প্রসিকিউটর (প্রধান কৌঁসুলি) ফাতো বেনসুদা তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত প্রি-ট্রায়াল চেম্বারের কাছে একটি আবেদন করেন। প্রধান কৌঁসুলির পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা করা হয় যে, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে যে জোরপূর্বক দেশত্যাগের মতো মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল তা মিয়ানমারের সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশের সীমানায় সংঘটিত হয়েছে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যেহেতু রোম সংবিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ আইসিসির একটি সদস্য রাষ্ট্র এবং অপরাধের একটি অংশ বাংলাদেশে ঘটেছে, সেহেতু আইসিসির এই অপরাধের বিচারার্থে এখতিয়ার থাকতে পারে। প্রধান কৌঁসুলি আরো যুক্তি দেন যে, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা একটি আন্তঃসীমান্ত অপরাধ অনেকটা সীমান্তের একপ্রান্ত থেকে গুলি করে অন্যপ্রান্তের কাউকে হত্যা করার মতো।

৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮:

আইসিসির প্রি-ট্রায়াল চেম্বারের বিচারকরা সিদ্ধান্ত নেন যে, জোরপূর্বক দেশত্যাগের মতো মানবতা বিরোধী অপরাধের বিষয়ে আইসিসির এখতিয়ার থাকতে পারে এবং সম্ভবত, অন্য সব অপরাধের ক্ষেত্রেও এর এখতিয়ার থাকতে পারে, যদি এটা প্রতিষ্ঠা করা যায় যে অপরাধের একটি অংশ বাংলাদেশে সংঘটিত হয়েছে।

৪ জুলাই ২০১৯:

প্রধান কৌঁসুলি বিচারকদের কাছে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধসহ যেকোনো মানবতা বিরোধী অপরাধের বিষয়ে তদন্তের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন । প্রধান কৌঁসুলির মতে, মূলত সে সমস্ত অপরাধের বিষয়ে তদন্ত প্রয়োজন, যেগুলো ৯ অক্টোবর ২০১৬ সাল থেকে অদ্যবধি সংঘটিত হয়েছে এবং অপরাধের অন্তত একটি অংশ বাংলাদেশের সীমান্ত সম্পৃক্ত আছে। প্রধান কৌঁসুলি জানান যে, তদন্ত চলাকালে সেই সমস্ত বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে যেগুলোর কারনে রোহিঙ্গারা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়েছে, কিংবা হত্যাকান্ড, যৌন নির্যাতন, গুম,ধ্বংস,লুটপাটের মতো অপরাধের শিকার হয়েছে তথা তাদের মৌলিক অধিকারসমূহের লঙ্ঘন ঘটেছে। একইসাথে জাতি বা ধর্ম পরিচয়ের কারণে রোহিঙ্গারা অমর্যাদাকর আচরণ বা নির্যাতনের শিকার হয়েছে কি না – সেইসব বিষয়েও তদন্ত করা হবে।

১৪ নভেম্বর ২০১৯:

আইসিসির প্রি-ট্রায়াল চেম্বারের বিচারকরা প্রধান কৌঁসুলির আবেদনকে অনুমোদন করেন এবং জানান যে, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যেকোনো অপরাধের এমনকি ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে পারে এমন অপরাধসমূহেরও তদন্ত করতে পারবে, যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধটি আইসিসির এখতিয়ারের মধ্যে থাকে এবং সংঘটনকালে অপরাধের অন্তত একটি অংশ বাংলাদেশের সীমান্ত সম্পৃক্ত থাকে। বিচারকরা এও বলেন যে, প্রধান কৌঁসুলির তদন্ত কেবল ৯ অক্টোবর ২০১৬ সাল থেকে সংঘটিত অপরাধগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরঞ্চ ২০১০ সালের ১ জুন বা তার পরে সংঘটিত অপরাধগুলোর তদন্ত করার ক্ষমতাও প্রধান কৌঁসুলির আছে (যখন থেকে বাংলাদেশ রোম সংবিধির সদস্য রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে)।

আইসিসি কেন মিয়ানমারের বাকি অংশে অন্যান্য অপরাধ তদন্ত করছে না?

মিয়ানমার আইসিসির সদস্য রাষ্ট্র নয়। দেশটি আইসিসি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন/চুক্তি তথা রোম সংবিধিও গ্রহণ করেনি অর্থাৎ মিয়ানমার এই চুক্তির "সদস্য রাষ্ট্র" নয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, মিয়ানমার আইসিসির এখতিয়ার গ্রহণ করেনি।

রোম সংবিধি অনুযায়ী, যদি কোনো অপরাধ একটি 'সদস্য রাষ্ট্র নয়' এমন দেশে সংঘটিত হয়, তবে কেবল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সেই অপরাধ তদন্ত বা বিচারের জন্য আইসিসির কাছে পাঠাতে পারে। ভূ-রাজনৈতিক কারণে, রোম সংবিধির এই নীতিটি এই মুহূর্তে মিয়ানমারের বাকি অংশে সংঘটিত অপরাধের তদন্ত বা বিচারের জন্য প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। নিরাপত্তা পরষিদরে কিছু সদস্য রাষ্ট্র, যেমন - চীন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তারা ভেটোর মাধ্যমে এই ধরনের নীতি প্রয়োগের বিরোধিতা করবে।

সম্ভাব্য পরবর্তী পদক্ষেপগুলো

প্রধান কৌঁসুলি একবার আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করার পর এটি শেষ করার জন্য কোনো সময়সীমা নেই এবং তদন্ত সম্পন্ন হতে বেশ কয়েক বছর সময়ও লাগতে পারে । প্রধান কৌঁসুলি প্রমাণাদি সংগ্রহ করবেন এবং সিদ্ধান্ত নেবেন যে, একজন অথবা বিভিন্ন অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা চালাতে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে কি-না। যদি হ্যাঁ হয়, তবে প্রধান কৌঁসুলি এক বা একাধিক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির জন্য আদালতের কাছে আবেদন করবে। গ্রেফতারি পরোয়ানা হলো একটি দলিল যা বিচারকদের আদালত কর্তৃক জারি করা হয় এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলিকে সন্দেহভাজন অপরাধীকে গ্রেফতারে সহায়তা করতে বলা হয়। গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রকাশ্য বা গোপনীয় ("দাপ্তরিক সিলের নিচে") হতে পারে। গোপনীয় গ্রেফতারি পরোয়ানার অর্থ হল গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা সত্ত্বেও জনসাধারণ এটি সম্পর্কে জানতে নাও পারে।

আইসিসির সাধারণ অপরাধীদের গ্রেফতারে কোনো নিজস্ব ক্ষমতা নেই। কেবল রাষ্ট্র (সরকার) সন্দেহভাজন অপরাধীদের গ্রেফতার করতে পারে। মিয়ানমার এটি পরিষ্কার করেছে যে, রাষ্ট্র হিসেবে এটি আইসিসিকে কোনো সহযোগিতা করবে না এবং কোনো সন্দেহভাজন অপরাধীকে গ্রেফতার করবে না। যদি কোনো সন্দেহভাজন অপরাধী আইসিসির সদস্য রাষ্ট্র এমন কোনো দেশে ভ্রমণ করে, তবে সেই দেশ ঐ সন্দেহভাজন অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। এমন সম্ভাবনা কম যে, সন্দেহভাজন অপরাধীরা সেই সমস্ত দেশে ভ্রমনের ঝুঁকি নিবে। সন্দেহভাজন অপরাধীদের গ্রেফতার না করা গেলে, বিচারও হবে না। অপরাধের বিচারের জন্য দোষী ব্যক্তির উপস্থিতি ব্যতীত আইসিসি কোনো বিচার সম্পন্ন করতে পারে না। সুতরাং, রাজনৈতিক পরিস্থিতি মারাত্মকভাবে পরিবর্তিত না হলে (বা অবধি) রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের কোনো বিচার হওয়ারও সম্ভবনা নেই।

নাগরিক সমাজ দ্বারা সম্ভাব্য সম্পৃক্ততাঃ

নাগরিক সমাজঃ

- সাধারণ জনগণকে আইসিসিতে বিচারের সীমাবদ্ধতা এবং সুবিধা বিষয়ে সচেতন করতে পারেন।
- তথ্য এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল সরবরাহ করে প্রধান কৌঁসুলিকে সহায়তা করতে পারেন।
- ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের আইসিসির কাছে (দরকার হলে আইআইএমএম-এর মাধ্যমেও) সাক্ষ্য দিতে এবং আইসিসির প্রক্রিয়াগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝাতে সহায়তা করতে পারেন।
- জবাবদিহিতার অংশ হিসেবে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রকাশ্য করার জন্য প্রধান কৌঁসুলিকে পরামর্শ দিতে পারেন।
- মিয়ানমারের সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে সচেতনামূলক প্রচার এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ করার জন্য আইসিসির কাছে তদবির করতে পারেন।
- আইসিসি ট্রাস্ট ফান্ড থেকে রোহিঙ্গা ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য সহায়তা কার্যক্রম শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তদবির করতে পারেন।

***